অনুভূতি যেথায় থমকে দাঁড়ায়!

| | |
|---|---|
| বই | **শূন্যস্থান** |
| লেখক | এনামুল হক ইবনে ইউসুফ |
| প্রকাশক | মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান |
| বানান সমন্বয় | মাকামে মাহমুদ, আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ |
| প্রচ্ছদ | মুহাম্মেব মুহাম্মদ |
| অঙ্গসজ্জা | মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম |

# শূন্যস্থান

অনুভূতি যেথায় থমকে দাঁড়ায়!

এনামুল হক ইবনে ইউসুফ

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

# প্রকাশকের কথা

জীবন মূলত শূন্যস্থান। হাজারো কোলাহলের মাঝে থেকেও মানুষ একাকিত্ব অনুভব করে। কখনো কখনো ভুলে বসে আপন সত্তাকে, আপন রবকেও। কিন্তু তিনি তার সৃষ্টিকে সুযোগ দেন। ফুরসৎ দেন ফিরে আসার। কেউ ফিরে আসে, কেউ হারিয়ে যায় আঁধারের গহিনে।

মানুষ কখনো কখনো দুনিয়ার নগন্য বস্তুর জন্য বিলিয়ে দেয় আপন সত্তাকে। রবের আমানত জেনেও আপন সত্তাকে ধ্বংসের জন্য উঠেপড়ে লাগে। ভুলে যায়, তার বন্ধুটি কেবল আল্লাহর একটি সৃষ্টি এবং তার জন্য পরীক্ষা। আর সে তাতে আপন সত্তা খুইয়ে বসেছে। হারিয়ে গিয়েছে কালের গর্ভে।

জীবনের ভাঙাগড়ার গল্প কেন এবং কোনটি উত্তম—তা কেবল রবই জানেন। তিনিই নির্ধারণ করেন ভূতভবিষ্যৎ। রাফিদ, ফাতিমা, রিনি কিংবা সোহান এ শূন্যস্থানেরই এক উপাখ্যান। জীবনের সেই শূন্যস্থান পূর্ণতা পেতে পারে কেবল রবের ভালোবাসায়। রবের প্রেম সাধনায়।

আল্লাহ আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করুন। আমাদের কাজে যা কিছু ভুল তা কেবলই আমাদের জ্ঞানের দীনতার দরুন। আর যা কিছু ভালো সবই আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।

**—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান**
১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রি.

# ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ! ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। যিনি আমাকে হাজারো প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো গোটা একটি উপন্যাস লেখার মতো শক্তি জুগিয়েছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রিয় হাবিব জনাবে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর। যাকে তিনি গোটা সৃষ্টিজগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন।

সত্যি বলতে কখনোই ভাবিনি, রিফলেকশন-এর পরে কখনো আর কোনো বই লিখতে পারব। কেননা একটা বই লেখার জন্য যতটা জ্ঞান ও ধৈর্যের প্রয়োজন তার কোনোটিই আমার মাঝে নেই। অতএব এই বইয়ের মাঝে যদি কোনো কল্যাণ নিহিত থাকে তবে তার হকদার একমাত্র আল্লাহ এবং এর বাইরে যত ভুলত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা একান্তই আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে।

'শূন্যস্থান' নামটা শুনলেই মনের মধ্যে কেমন যেন একটা খালি খালি ভাব চলে আসে, তাই না? মনেহয় কী যেন নেই। কোথায় যেন কীসের একটুখানি অভাব। হ্যাঁ, আমাদের জীবনে এরকম অসংখ্য অগণিত শুন্যস্থান লুকিয়ে আছে। একজন শিক্ষিত বেকার ছেলের কাছে চাকরি না পাওয়ার অভাবটাই হচ্ছে শূন্যস্থান। পছন্দের জিনিসটা (ব্যক্তি/বস্তু) নিজের করে না পাওয়ার যন্ত্রণাটাই ব্যক্তির হৃদয়ে সৃষ্টি অদৃশ্য সেই শূন্যস্থান। জন্ম থেকেই শূন্যস্থান আমাদের প্রতিনিয়ত তাড়া করে বেড়াচ্ছে। নেই বলে—এই যে নেই নামক অনুভূতিটা—এর হাত থেকে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিটিরও রেহাই নেই।

তবে এত এত শূন্যতার মাঝেও কিছু কিছু শূন্যতা আবার আমাদের নতুন করে নিজেকে নিয়ে ভাবতে শেখায়। নিজেকে নতুন করে চিনতে শেখায়।

আত্মোপলব্ধির এই অনুভূতিটার নামই হচ্ছে শূন্যস্থান। হৃদয়ে শূন্যতা জন্মাতে না পারলে সেখানে সভ্যতার নতুন সংস্করণ কীরূপেই-বা ঘটবে? যেমন করে শীতের রুক্ষতার পরে বসন্ত প্রাণের স্পন্দন নিয়ে সবুজে-শ্যামলে প্রকৃতিকে নবরূপে সাজিয়ে তোলে, তেমনি মানবহৃদয়ে সৃষ্ট শূন্যস্থানও ব্যক্তিকে ভেঙেচুড়ে নতুন এক আমিতে বদলে দিয়ে জীবনে আনে এক নতুন জোয়ার। প্রত্যাবর্তনের সেই জোয়ারের সূচনালগ্ন নিয়েই আমাদের আজকের এই আয়োজন 'শূন্যস্থান'।

অতএব, শূন্যস্থান কেবলই আবেগ নয়। প্রতিটি সুস্থ মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষও ডজন খানেক শূন্যতা বয়ে বেড়ায়। অনুভূতি জাগ্রত হয় অপ্রাপ্তির বেদনায়। নেই বলেও কিছু একটা তো আছে। সৌরজগতের দিকে একটিবার তাকিয়ে দেখুন—সীমাহীন ওই বিশালতার নামও নাকি মহাশূন্য। অতএব, শূন্যস্থান—অভিমান নয়, আর না অভিশাপ। শূন্যস্থান—একটি অনুভূতির নাম। যার পরে আর কোনো অভিযোগ বাসা বাঁধে না। সুতরাং আসুন নিজের ভেতরে লুকিয়ে থাকা চিরচেনা সেই শূন্যস্থানটুকুকে খুঁজে বের করে রবের দিকে ফিরি। অনেক তো হলো; ফিরতে যে হবেই এবেলা। কি ফিরবেন তো?

আপনার ভাই
**এনামুল হক ইবনে ইউসুফ**
enamulbiny@gmail.com
৩১ জানুয়ারি ২০২২

অনুভূতি যেথায় থমকে দাঁড়ায়!

এই নিখিল বিশ্বে আপনি মোটেই একা নন!

ওই লাওহে মাহফুজ, আরশে মুয়াল্লা—যার ইশারায় আছে, তিনিই তো সৃজিছে আপনারে!

হে পথিক, যাযাবর আবাবিল—শোনো, শুনে যাও একটিবার। যিনি প্রতিটি পত্রপল্লবেরও রোজ নিয়ম করে খোঁজ রাখেন; তুমি কী ভেবে ব্যাকুল হলে, সেই সুমহান স্রষ্টা-রহমান তোমায় ভুলিয়া থাকেন!

[এক]

গত একটি রাত নির্ঘুম কাটাবার পর হাসপাতালের আইসিইউর সামনে মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে আছে রাফিদ-ফাতিমা দম্পতি। বিষণ্ণতায় ছেয়ে আছে ওদের গোটা অস্তিত্ব। কারো মুখে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই। কান্না করার শক্তিটুকুনও এতক্ষণে হারিয়ে বসে আছে ফাতিমা। স্বামী-স্ত্রীর এ রকম দুশ্চিন্তা-দুর্দশার মূল কারণ হচ্ছে—ওদের একমাত্র ছেলে রাইয়ান। রাইয়ান নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত। কয়েক দিন যাবৎ টানা বৃষ্টিতে ভিজে গত পরশুদিন থেকেই শয্যাশায়ী সে।

শুরুতে সাধারণ জ্বর-সর্দি ভেবে স্বামী-স্ত্রী দুজনের কেউই গায়ে তেমন না মাখলেও, গতরাতে ছেলেটা যখন রীতিমতো নিঃশ্বাস ফেলতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছিল ফাতিমা তখন ওর ছয় বছরের ছোট্ট ছেলেটিকে নিয়ে যারপরনাই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। শেষমেশ গতকাল রাতে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় ছেলেকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটে এলো রাফিদ-ফাতিমা।

ডাক্তার রিচার্ড ডকিন্স পূর্বপরিচিত হওয়ায় খুব একটা বেগ পোহাতে হয়নি ওদের। হাসপাতালে আসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আইসিইউতে রুম দেওয়া হলো রাইয়ানের জন্য। অবস্থা বেগতিক দেখে তৎক্ষণাৎ অক্সিজেন দেওয়া হলো। ব্যস, এরপর স্বামীকে জড়িয়ে

ধরে তাক ছেড়ে কান্না শুরু করে দিলো ফাতিমা। রাফিদও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, কিন্তু ফাতিমাকে সামলানোটা এই মুহূর্তে খুব বেশি জরুরি। অবশেষে নিজের বুকে পাথর চেপে প্রিয়তমা স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেওয়া শুরু করল রাফিদ।

হাসপাতালের পরিবেশ ক্রমশ ঘোলাটে হয়ে যাওয়ায় একসময় নিজ থেকেই চুপ হয়ে যায় ফাতিমা। সেকেন্ড-মিনিট পেরিয়ে যেতে না যেতেই আবার বুকটা ভারী হয়ে আসে ওর। গ্লাসের ফোকর থেকে সন্তানের নিস্তেজ শরীর আর হাপরের ন্যায় বুকের ওঠানামার করুণ দৃশ্য দেখে বারবার কান্নায় ফেটে পড়ে ওর নেত্রদ্বয়। কিন্তু এবার গোঙানির শব্দ ব্যতীত আর কোনো শব্দ হয় না তাতে। রাফিদও আর বাধা দেয় না; কাঁদুক, অন্তত বুকটা তো হালকা হবে। এরপর একসময় নিজ থেকেই থেমে যাবে ও। হ্যাঁ, একটু পর ঘটলও তা-ই; ফাতিমা এক্কেবারে চুপচাপ। তীব্র শোকে যেন পাথরই হয়ে গিয়েছে বেচারি।

হাসপাতালের খোলা বারান্দার এক কোণে লাগোয়া দেয়াল ঘড়িতে সময় তখন সকাল দশটা। একটু আগেই ফাতিমার ছোট ভাই ফাহাদকে নিয়ে হাসপাতালে এসেছেন রাইয়ানের নানু। মাকে দেখেই বুকের চাপা কষ্টটা যেন আরও বহুগুণে বেড়ে গেল ফাতিমার; কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটা। ফাহাদ ভগ্নীপতির কাঁধে হাত রেখে তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজেই ফেটে পড়ল বাঁধভাঙা জোয়ারে। একমাত্র ভাগ্নের প্রতি তারও যে ভালোবাসার কোনো কমতি নেই।

দেখতে দেখতে সূর্য ঢলে পড়ে পশ্চিমে। আকাশজুড়ে বিরামহীন কালো মেঘেদের নীরব অনশন চলছে। এই যেন অঝোরে নামবে শ্রাবণ। ফাতিমা ওর স্বামীকে ডেকে বলল, 'তুমি তাহলে এখন বাসায় চলে যাও, তোমারও তো শরীর খারাপ। তা ছাড়া এখানে তো থাকারও জায়গা নেই বিশেষ। মা তো আছেনই আমার সঙ্গে। আমরা দুজন বেশ থাকতে পারব এখানে।'

'হ্যাঁ ভাইয়া, তুমি বাসায় চলে যাও, আমি তো আছি এখানে; কোনো চিন্তা নেই, তুমি বরং বাসায় গিয়ে বিশ্রাম করো গিয়ে। চলো আমি তোমাকে গাড়ি করে নামিয়ে দিয়ে আসি।' বলল ফাহাদ।

'না থাক। এটুকুই তো পথ, আমি একাই ড্রাইভ করে যেতে পারব।' রাফিদের জবাব। 'সে যাও কিন্তু সাবধানে। এক ফোঁটা বৃষ্টির পানিও যেন মাথায় না লাগে। এমনিতেই তোমার জ্বর। শেষে বাপ-ছেলে দুজনকে নিয়ে আমার জ্বালার শেষ থাকবে না!' ফাতিমার চোখে তীব্র উৎকণ্ঠা।

'সমস্যা নেই, এ বৃষ্টি আসতে এখনো ঢের দেরি; তার আগেই আমি বাড়ি গিয়ে পৌঁছাব—দেখে নিয়ো তুমি।' রাফিদের সরল আত্মবিশ্বাস।

ফাতিমা আর কথা বাড়াল না। কারণ, ও জানে—রাফিদকে আটকানো যাবে না। অবশেষে প্রিয়তমা স্ত্রী ও একমাত্র ছেলেকে হাসপাতালে রেখে বিষণ্ণ মন খারাপের আকাশটা মাথায় করে বাড়ির দিকে পা বাড়াল রাফিদ।

[দুই]

হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে গাড়ির চাকা হঠাৎ পাংচার হওয়ায় রাফিদ পড়ল বিপাকে। গ্যারেজে কোনো রকমে গাড়ি রেখে বেরোতে যাবে এমন সময় শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি! গোটা ঢাকা শহর মুহূর্তেই যেন জনমানবশূন্য হয়ে পড়েছে। এমনকি একটা সাইকেল রিকশা পর্যন্ত কোথাও নেই। ঠোঁটের কোণে এক টুকরো বিরক্তির ভাব এনে রাফিদ বলল, 'এটা কী হলো? আচ্ছা গ্যাঁড়াকলে পড়লাম তো!' সময় যত গড়ায় বৃষ্টির গতি যেন ততই বাড়ে। উদাস নয়নে বেশ কিছুক্ষণ সেসব চেয়ে চেয়ে দেখল রাফিদ; কিন্তু আর আটকানো গেল না ওকে। শেষমেশ ধৈর্যের পরীক্ষায় ফেল মেরে চৌধুরী মশাই বৃষ্টিতে কাঁকভেজা হয়ে তবেই বাসায় ফিরলেন।

মসজিদে ততক্ষণে মাগরিবের আজান পড়ে গিয়েছে। তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে রাফিদ গিয়ে দাঁড়াল বারান্দায়। দোতলার কার্নিশ ধরে দাঁড়িয়ে থাকা মস্ত আমগাছটা বেয়ে বেয়ে বৃষ্টির জল গড়িয়ে নামছে রেলিং ছুঁয়ে। দখিনা দমকা হাওয়ায় বৃষ্টির ঝাপটা এসে আছড়ে পড়ছে ঘরের ভেতরে, রাফিদের চোখে-মুখে।

সালাত শেষ করে আবারও বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায় রাফিদ। প্রকৃতি যেন ওর থেকেই বিষণ্ণতা ধার করেছে আজ। হাসপাতাল থেকে ফাতিমা কল করেছিল একটু আগে। 'চিন্তা করো না। রাতে খেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে যেয়ো।' বলে সেবেলা ফোন রেখে দিলো ফাতিমা। একেবারেই চিন্তাহীন থাকাটা যে অসম্ভব সেটা দু-প্রান্তের দুজনেই জানে; কিন্তু এ ছাড়া উপায় কী? একটু পর বাড়ির কাজের লোক আকবর কাকা এসে রাফিদকে রাতের খাবারের জন্য কী রান্না করবেন সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। প্রত্যুত্তরে রাফিদ সে রকম কোনো সায় না দেওয়ায় অগত্যা আকবর কাকা নিজেই রান্নাঘরে গিয়ে উনুনে চালডাল বসিয়ে দিলেন খিচুড়ির জন্য।

রাফিদ খিচুড়ি খেতে খুব ভালোবাসে; কিন্তু আজ তো তার মন খারাপ! তবুও রান্না করলেন তিনি। বোধহয় পৃথিবীর সবচেয়ে সহজতম রান্নাটি হচ্ছে এই খিচুড়ি, তা ছাড়া সময়টাও একটু কম লাগে কি না! তাই তাড়াহুড়ো করে খিচুড়িই চাপিয়ে দিলেন আকবর।

তার সন্তানতুল্য রাফিদ সারাদিনে তেমন কিচ্ছুটি মুখে তোলেনি, এটা তার কাছে বড়ই ক্লেশের ব্যাপার। আর অন্যদিকে রাইয়ান দাদুভাইয়ের জন্যেও তার মন কাঁদে। ছয়

বছরের ছোট্ট ফুটফুটে ছেলে রাইয়ান। সারাদিনই সে দুষ্টুমিতে মাতিয়ে রাখে গোটা বাড়ি। বিকেলে আকবর দাদুর সাথে সে ফুটবল খেলে, কখনো ঘুড়ি ওড়ায় তো কখনো লুকোচুরি খেলে।

বারবারই সে পেছন থেকে এসে আকবর দাদুকে ধরে ফেলে। জিতে যায় রাইয়ান, হেরে যায় আকবর দাদু। এরপর খিলখিল করে সে হাসে আর বলে, 'বোকা দাদু, একদম লুকাতে পারে না, হিহিহি।' আকবর দাদুও হাসে। কারণ, এই হাসির কাছে হাজারবার হেরে যেতেও কোনো আফসোস নেই তার, বরং এই হাসির জন্য সে নিজেকে কুরবান করতেও সর্বদা প্রস্তুত। কিন্তু আজ সেই হাসিটা স্বরের তীব্র দহনে মিলিয়ে গিয়েছে। তাই আকবর দাদুর হৃদয়ে ভিড় করেছে এক আকাশ মন খারাপের কালো মেঘ। এসব ভেবে ভেবে চুলোর কাছে দাঁড়িয়ে গামছায় চোখ মুছলেন আকবর। এরপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সৃষ্টিকর্তার নিকট রাইয়ানের সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করলেন তিনি।

আকবর এই বাড়ির অনেক পুরাতন কাজের মানুষ। রাফিদের বাবার আমল থেকেই তিনি এই বাড়িতে আছেন। বড় সাহেবের মৃত্যুর পর তিনিই পরম মমতায় আগলে রেখেছেন তার পুত্রতুল্য ছোট সাহেব রাফিদ আর গোটা চৌধুরী বাড়িটাকে।

রান্না প্রায় শেষ; এমন সময় বাজ পড়ার বিকট শব্দ এলো তার কানে। রান্না ফেলে রেখেই তিনি ছুটলেন ওপর তলায়, রাফিদের ঘরে। বেডরুমের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে রাফিদ। একমনে কী যেন দেখছে সে। পেছনে দাঁড়িয়ে আছে আকবর। তিনি আঁচ করতে চেষ্টা করছেন যে, বাজ পড়ার শব্দে রাফিদের আবার কোনো অসুবিধে হলো কি না। রাফিদ ভয় পেল কি না। কিন্তু না, সে রকম তো কিছুই হয়নি। রাফিদ দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে জানালার দিকে মুখ করে। ওর হাত ছুঁয়ে আছে বন্ধ কাচের জানালা। ওপাশে নীরব বৃষ্টির ধারা। এতটা কাছে তবু কেউ কাউকে ছুঁয়ে দেখতে পারছে না। দুজনের এই ক্ষুদ্র ব্যবধানের পেছনে কত যে অব্যক্ত ইতিহাস লুকিয়ে আছে তা কি আর বৃদ্ধ আকবর জানে? তাই তো নীরবে আগমন ঘটিয়ে ফের নীরবেই প্রস্থান করলেন তিনি।

রাফিদ আর ফাতিমার ছোট্ট সংসার। সাকুল্যে তাদের পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা চার। স্বামী-স্ত্রী, তাদের একমাত্র সন্তান রাইয়ান আর বৃদ্ধ কাজের লোক আকবর। আকবরকে দিয়ে কাজ এখন আর বিশেষ না হলেও সম্পর্কের বন্ধনে তাকে ছাড়া এই পরিবারটা যেন অচল, অসম্পূর্ণ। ভালোবাসার ঋণ বড় ঋণ, না যায় শোধ করা আর না যায় অস্বীকার করা।

জানালার ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীন আমগাছটায় এককালে এক চড়ুই দম্পতি বাস করত। তাদের ঘরে দুটো বাচ্চাও ছিল। রাফিদ তখন বেশ ছোটো। স্কুল থেকে এসে সেদিন প্রথম ব্যাপারটা জানতে পারে আকবর কাকার কাছে। দোতালার জানালা পরিষ্কার করতে গিয়ে প্রথম তার চোখে পড়ে সেই বাসা। খবর শুনেই এক দৌড়ে রাফিদ

ছুটে যায় বারান্দায়। গিয়ে দেখতে পায়—আমগাছের গায়ে ছোট্ট কোটরে মুখ বের করে বসে আছে একটি চড়ুই, কিচিরমিচির শব্দ করে নিজেদের ভাষায় পাখিটার সাথে কথা বলছে বাচ্চা দুটো। খানিক বাদেই অন্য একটি চড়ুই মুখে খাবার নিয়ে উড়ে এলো।

এরপর বাচ্চাদের খাইয়ে আবার ফুড়ুত করে কোথায় যেন চলে গেল পাখিটা। রাফিদ বুঝতে পারল বাচ্চাগুলো ক্ষুধার্ত, আর যে পাখিটা খাবার খাওয়াল সেটা ওদের বাবা। আর সঙ্গে থাকা চড়ুইটি ওদের মা।

সেদিনের পর থেকে পাখি দেখার জন্যে হলেও অন্তত একবার এ ঘরে আসত রাফিদ। সেদিনের পর থেকে পাখিদের নিয়ে আগ্রহের কোনো সীমা থাকে না রাফিদের। সুযোগ পেলেই কখনো বাবা, কখনো মা কিংবা আকবর কাকাকে ধরে বসে রাফিদ। এরপর করতে শুরু করে একের পর এক হাস্যকর প্রশ্ন। বাবা-মা সেসব উদ্ভট প্রশ্নগুলোকে সেভাবে গায়ে মাখতেন না। তাঁরা তো হেসেই খানখান। মাঝে মাঝে একটু বিরক্তি ভাবটাও চলে আসত বটে; কিন্তু বেচারা আকবর কাকা কখনোই বিরক্ত হতেন না। উলটে তার আশকারা পেয়ে রাফিদটা যেন আরও পেয়ে বসত। সে অনেক বছর আগের কথা। আমগাছটার সেই ছোট্ট কোটর আজ শূন্য। তবু আজও বারান্দায় এলে সেসব স্মৃতি সতেজ হয়ে ধরা দেয় চোখের সামনে। মুয়াজ্জিনের কণ্ঠস্বরের শব্দে ফের রাফিদের সংবিৎ ফিরে আসে। ইশার সময় হয়ে গিয়েছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজেকে সামলে নেয় রাফিদ।

সালাত শেষ করে রাতের খাওয়া-দাওয়া পর্ব মিটিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দেয় রাফিদ। বাইরে তখনও মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। সারাদিনের ক্লান্তির পর দু-চোখে ঘুম নেমে আসে ওর। কিছু সময়ের ব্যবধানেই গভীর ঘুমে তলিয়ে যায় রাফিদ। ঘুমের মধ্যে রাফিদ একটা স্বপ্ন দেখে; যেটা ও আগেও অনেকবার দেখেছে। তবে সেগুলো কিছুটা অস্পষ্ট আর ঝাপসা ছিল। কিন্তু আজ ও যা দেখল তা পুরোটাই যেন মাত্রই ঘটল ওর সাথে। রাফিদ দেখল—এক বৃষ্টিস্নাত রাতে ও ওর টেবিলে কাজ করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছে, ঠিক এমন সময় ওর মোবাইলে একটা অপরিচিত নম্বর থেকে কল আসে। রিসিভ করে মোবাইলটা কানে ধরে রাফিদ।

'হ্যালো, কে?'

ওপাশ থেকে একটা মেয়েলি কণ্ঠে জবাব আসে—'আমি, রাফিদ আমি!'

রাফিদ হকচকিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে,

'আমি মানে, আমিটা কে?'

'আমি রিনি, তুমি কোথায়? এখনো আসছ না যে? এদিকে আমি সেই কখন থেকে শাড়ি পরে বউ সেজে বসে আছি, তোমার মোবাইল বারবার ব্যস্ত বলছে। এসবের মানে কী রাফিদ?'

উত্তেজনা ক্রমাগত বাড়ছে রাফিদের, কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমছে ওর। 'রিনি, তুমি এত রাতে? শাড়ি পরে বউ সেজে আছ মানে, তুমি...'

কথা অসম্পূর্ণ রেখেই রাফিদ চুপসে যায়। ওপাশ থেকে মেয়েটা বলে ওঠে, 'কী আমি? কী যা-তা বলছ এসব? তোমার শরীর ঠিক আছে তো? আর বউ সেজে আছি কেন তুমি জানো না? আজকে না আমাদের বিয়ে? আমাদের না আজকে রাত নটায় কারওয়ান বাজার কাজি অফিসে আসার কথা? তারপর আমরা লংড্রাইভে সিলেট যাব হানিমুনে। তুমি তাড়াতাড়ি এসো। দেখো বাইরে কী সুন্দর বৃষ্টি হচ্ছে। তোমার ছাতা আছে? না থাকলে ভিজতে ভিজতে চলে এসো, আমার একা একা ভিজতে একটুও ভাল্লাগছে না। প্লিজ জলদি এসো।' এই বলে কল কেটে দিলো রিনি।

রাফিদের হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। ধূসর আকাশের বুকে তখনও এক ফালি রুপোলি চাঁদ ঝুলে আছে সূর্য ওঠার প্রতীক্ষায়। আর একটি নতুন দিনের সূচনা করে সে বিদায় নেবে। বাইরের বৃষ্টি থেমে গিয়েছে অনেক আগে, তবুও একটা শীতল হিম স্রোত জানালার বুক চিরে শরীরে এসে লাগছে রাফিদের। প্রকৃতিতে এ যেন ওরই বিষণ্ণতার বহিঃপ্রকাশ। স্বপ্নের ভাবনায় বিভোর হয়ে আছে রাফিদ। ব্লেশ কাটেনি ওর কিংবা হয়তো ব্লেশ কাটতেই দিচ্ছে না ও। একসময় দূরের মসজিদ থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে আসে। চারিপাশ ক্রমশ পরিষ্কার হতে থাকে। দু-হাত দিয়ে চোখ দুটো কচলে নিয়ে রাফিদ হাঁটা লাগায় বেসিনের দিকে।

[তিন]

মানুষের জীবনে সব অতীত কি আর এত সহজে ভুলে থাকা যায়? না, যায় না। কিছু অতীত স্মৃতি মনের কোনো এক কোণে ঠিক ঘাপটি মেরে বসে থাকে জন্ম জন্মান্তর ধরে। মাঝে মাঝে সেই অতীত—চেনা কোনো মুহূর্তে স্বগৌরবে নিজের বিস্তৃত ডাল-পালাসমেত প্রকাশিত হয়। রাফিদের বেলাতেও আজ তেমনটাই ঘটেছে। কিছু পুরোনো অতীত এত বছর পরেও মাথাচাড়া দিয়ে নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছে। রাফিদ দোতলায় শোবার ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ। হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়তেই তড়িঘড়ি সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসে। ছুটে যায় স্টোর রুমের দিকে।

রুমটা তালাবদ্ধ। বাসার অন্য সব ঘরের চাবির সঙ্গে এই রুমের চাবিটাও ফাতিমার কাছে থাকে। তাহলে এখন উপায়? কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবার পর রাফিদের হঠাৎ মনে পড়ে যায়, আকবর কাকার কাছেও তো একসেট চাবি থাকবার কথা। দেখভাল ও গোছগাছের তাগিদে ফাতিমা তাকে দিয়ে রেখেছে। তৎক্ষণাৎ আকবর কাকার থেকে চাবি চেয়ে নিয়ে স্টোর রুমের দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে রাফিদ। ছোট্ট সেই ঘরটি

পুরাতন সব জিনিসপত্র দিয়ে ঠাঁসা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কয়েকটি তাকভর্তি বই, পুরাতন নথিপত্রের স্তূপ ও ভাঙাচোরা সেকেলে আসবাবপত্র ইত্যাদি। রুমের কোণে কোণে সময়ের আবরণে ধুলোর আস্তরণে আটকে আছে অনেক মাকড়সার জাল। দরজা খুলতেই একটা গুমোট ভ্যাপসা দুর্গন্ধ ভেসে এলো রাফিদের নাকে। অন্ধকার হাতড়ে গিয়ে রুমের লাইটটা জ্বালিয়ে দিতে চেষ্টা করল রাফিদ। কিন্তু না, লাইট জ্বলছে না। মরচে ধরে লাইনে ত্রুটি ঘটতে পারাটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। সেই কবে এ ঘরে কোনো মানবের পদচিহ্ন পড়েছিল তারও কি ঠিক আছে? অগত্যা রুম থেকে ছোট একটা টর্চ এনে জ্বালাল রাফিদ।

টর্চের আলো ফেলে সন্তর্পণে বইয়ের তাকের দিকে এগিয়ে যায় রাফিদ। কোনো এক বিশেষ বস্তুর খোঁজে মরিয়া হয়ে খুঁজতে থাকে এ তাক থেকে ও তাক। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পরে হাতে করে একটা চারকোনা বাক্সসমেত ঘামে ভেজা শরীর নিয়ে রাফিদ সেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। চাপা উৎকণ্ঠা নিয়ে কাজের ঘরে ফিরে টর্চটা টেবিলের এক প্রান্তে উপুড় করে রেখে রহস্যময় সেই বাক্সটির দিকে বেশ কিছুক্ষণ অপলকে তাকিয়ে থাকে রাফিদ। এতকাল পর বাক্সটা দেখে চোখে-মুখে কেমন যেন একটা চাপা উত্তেজনার লহর খেলে যাচ্ছে ওর; চার দেয়ালের গোপন সীমানা ছাপিয়ে যা অন্য কোনো মানবীয় চোখে ধরা দেয়নি এই মুহূর্তে। এইবার রহস্য উদ্ঘাটনের পালা।

দীর্ঘশ্বাসের আড়ালে নিজের উত্তেজনাকে সাময়িকের জন্য ইস্তফা জানিয়ে বাক্সের গায়ে লাগোয়া তালাটার দিকে হাত বাড়ায় রাফিদ। হ্যাঁচকা টান দিতেই বহু দিনের জং ধরা তালাটা ক্যাচক্যাচ শব্দ করে খুলে যায়। তালাসমেত বাক্সটাকে একপাশে সরিয়ে রেখে ভেতরে থাকা রহস্যময় সেই বস্তুটিকে বের করে আনে রাফিদ। কাঙ্ক্ষিত সেই রহস্যময় বস্তুটি হচ্ছে প্লাস্টিকের মোটা একটা ব্যাগ। যার ভেতরে মুড়িয়ে রাখা আছে একটি লাল মলাটের পাণ্ডুলিপি!

রাফিদের উত্তেজনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সেইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে নাকে-মুখে ধুলোবালি ঢুকে একাকার অবস্থা। ডাস্ট অ্যালার্জির সমস্যা আছে রাফিদের। তাই ধুলো আর ঘামে অবস্থা ততক্ষণে সাংঘাতিক পর্যায়ে চলে গিয়েছে। পাণ্ডুলিপিটা টেবিলের ওপরে রেখেই কোনো রকমের হাঁচি থামিয়ে মুখ চেপে রুম থেকে বেরিয়ে আসে ও। এরপর হাতে টাওয়েল চাপিয়ে সোজা চলে যায় গোসলখানায়। ঘড়িতে তখন সাড়ে সাতটা। আরও একজন এত সকালে ঘুম থেকে উঠে গিয়েছে, রাইয়ান।

রাইয়ানের শরীরটা আজ অনেকটাই ভালো মনে হচ্ছে, খুব ভালো লাগলেও যে মানুষের খুব সকাল সকাল ঘুম ভেঙে যেতে পারে হয়তো রাইয়ানের তা জানা ছিল না। রাইয়ান ওর মাকে খুঁজতে থাকে, কিন্তু রুমের ভেতরে কেউই নেই। অক্সিজেন মাস্কটা মুখের সাথে লাগানো। সেসব দেখে নিজেকে নিজের কাছেই কেমন যেন বড্ড অচেনা লাগছে

ওর। বেশ কিছুক্ষণ পর নিজের অবস্থানের ব্যাপারে পুরোপুরি জ্ঞাত হবার পরে রাইয়ান যখন বুঝতে পারল এই মুহূর্তে কেউই ওকে সঙ্গ দিতে পারবে না, তখন ও আবার ঘুমানোর চেষ্টা করে এবং একটা সময় পর আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

সকাল আটটা, রাফিদের গোসল শেষ হয়েছে। হাতে এক কাপ গরম কফি নিয়ে রাফিদ ফের কাজের রুমে ফিরে এলো। এরপর টেবিলে রাখা সেই প্লাস্টিকের ব্যাগটা থেকে পাণ্ডুলিপিটা বের করে হাতে নিল। বহুকালের অযত্নকৃত ধুলোয় সবটা যেন একটা ঝাপসা অবয়ব মাত্র। রাফিদ পাতা ওলটায়। প্রথম পাতায় লেখা 'নীলাম্বরী তোমার জন্য'। এটি একটি অসম্পূর্ণ উপন্যাস। আর তার চাইতেও বড় আশ্চর্যের বিষয়টি হচ্ছে সেই পাণ্ডুলিপিটির লেখক রাফিদ নিজেই। রাফিদ আবারও পাতা ওলটায়, পরের পৃষ্ঠায় লেখা—উৎসর্গ :

রুহাইমা যীনাত রিনি
রিনি হচ্ছে আমার চোখে দেখা
এমন এক বিস্ময়কর নারী শক্তি,
যার স্পর্শ লাভে একজন ভবঘুরে
পথিকের চোখেও সাজিয়ে গুছিয়ে
সংসার বাঁধার ইচ্ছে জেগেছিল

রাফিদ একেকটি পাতা ওলটাতে থাকে আর বিস্ময়াভিভূত নয়নে তাকিয়ে থাকে। অতীত থেকে মুছে ফেলা সব স্মৃতিগুলো একে একে ওর চোখে ক্রমশ পরিষ্কার হতে থাকে। মানুষ চাইলেও নিজের অতীতকে পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারে না, লাল মলাটের এই অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিটা যেন তারই প্রমাণ দিচ্ছে। যে অতীতকে রাফিদ সময়ের কোলে কবর দিয়ে এসেছে আজ এত এত বছর পরেও সময় ঠিকই তাকে তা সুদ সমেত ফিরিয়ে দিলো।

রাফিদের চোখের কোণে নীরব অশ্রু, শব্দ নেই তার। ফোঁপানির কোনো আওয়াজ ওঠে না তাতে। কেবল নিশ্চলভাবে ওর চোখ দুটো তাকিয়ে রয়েছে কয়েকটা আধ খাওয়া কাগজের ওপরে লেখা বহুকাল আগের অস্পষ্ট কিছু লাইনের ওপরে। এই কি তবে নিয়তি? ভেতরে লুকিয়ে থাকা অন্তরাত্মা প্রশ্নের তির ছুড়ে দেয় ওর দিকে। জবাব চায় সে; কিন্তু রাফিদের কাছে আজ কোনো উত্তর নেই।

আজকের সকালটা ঠিক কেমন ছিল তা জানা নেই রাফিদের। ওর সমস্ত সত্তাজুড়ে ছিল অতীত। বর্তমানকে কয়েক মুহূর্তের জন্য ভুলেই বসে আছে ও। কোথায় আছে, কী করছে কিছুই যেন ওর চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে নেই এখন। ওর দৃষ্টি, ওর ভাবনা সবটাই

লাল মলাটের ওই পাণ্ডুলিপিতে। অসমাপ্ত সেই উপন্যাসের পাতা ওলটাতে ওলটাতে অজান্তেই অতীতে ফিরে যায় রাফিদ।

এই গল্পের শুরুটা হয় বেশ কয়েক বছর আগে, বাবা-মা দুজনেই তখন বেঁচে আছেন। রাফিদ তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষ শেষ করেছে। রাফিদের পুরো নাম রিফকাত চৌধুরী রাফিদ। ধানমন্ডি শংকরে—'চৌধুরী প্যালেস' নামের এই বাড়িতেই তখন ওরা থাকে। রাফিদের বাবা একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্যারিস্টার। নাম মওদুদ আহমেদ চৌধুরী। তাকে সবাই ব্যারিস্টার সাহেব বলেই ডাকেন। মা শাহনাজ পারভিন খুশি একজন পুরোদস্তর গৃহিণী। রফিদরা মোট চার ভাই-বোন। দুই ভাই, দুই বোন। রাফিদের বড় ভাই থাকেন ইউএসএ-তে, বাবার মতন তিনিও একজন ব্যারিস্টার। এরপর মেজো আর সেজো দুই বোন। রেহানা আর রবিনা। এই তো কয়েক বছর হলো ওদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান হচ্ছে রাফিদ, তাই তো আদরের সবটাই যেন ছিল ওর দখলে।

রিফকাত নামটা রেখেছিলেন রাফিদের দাদা। নাতিকে নিয়ে তার ভাবনা ছিল বরাবরই অন্য রকমের; কিন্তু বুঝ হবার পর থেকেই রাফিদ হেঁটে চলেছিল এক ভিন্ন পথে। মোহ আর চাকচিক্যময় এই ধুলোর পৃথিবীতে যে পথ মানুষকে কেবল হতাশা আর অপ্রাপ্তির সুখ ব্যতীত কখনোই কিছু দিতে পারেনি।

'রাফিদ বাবা, ও রাফিদ বাবা!' আকবর কাকার ডাকে সংবিৎ ফিরে পায় রাফিদ। হকচকিয়ে ফিরে তাকায় আকবরের দিকে।

'বাবা!, রাইয়ান দাদু-ভাইকে দেখতে হাসপাতালে যাবে না? অনেক বেলা হয়ে গেছে তো।'

নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে আশেপাশে তাকায় রাফিদ। 'মোবাইল আমার মোবাইল?' আকবর গিয়ে মোবাইল এনে দেয় হাতে।

সকাল দশটা বেজে গেছে। আজ যেন কিছুতেই হিসেব মেলাতে পারছে না রাফিদ। আকবর চাচা নাশতা দেয়, নাশতা খেতে খেতেও আনমনে ভাবে কী হচ্ছে এটা ওর সাথে? ফাতিমা এখনো কোনো কল করেনি, তবে কি কোনো অসুবিধে হলো রাইয়ানের? হঠাৎ ওদের জন্য দুশ্চিন্তা হয় রাফিদের। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে, নইলে এতক্ষণে ফাতিমার একটা হলেও ফোনকল আসত। নাকি বাসার টেলিফোনে যোগাযোগ করেছে আকবর কাকার সঙ্গে?

'আকবর কাকা, ও আকবর কাকা!' রাফিদ জোরে জোরে ডাকতে থাকে। আকবর ঘর গোছানোর কাজে ব্যস্ত ছিল, ডাক শুনে তৎক্ষণাৎ তিনি ছুটে চলে আসেন খাবার রুমে।

'হ্যাঁ বাবা, আমায় ডাকলে?'

'আপনার বৌমা ফোন করেছিলেন নাকি হাসপাতাল থেকে?'

'হ্যাঁ বাবা, আমি তো ভুলেই গেছিলাম। মা ফোন দিয়েছিলেন। তুমি ঘুম থেকে উঠেছ কি না। উঠলে নাশতা খেয়ে তারপর হাসপাতালে যেতে বলেছেন। তা আরও ঘণ্টা খানেক আগে; কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছিল দেখে আবার ফোন করে বললেন যেন বৃষ্টি থামলে তারপর পাঠিয়ে দিই তোমাকে।'

[চার]

নাশতা শেষ করে রাফিদের হাসপাতালে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেলা সাড়ে এগারোটা। হাসপাতালে এসেই রাফিদ সোজা চলে গেল আইসিইউ রুমের সামনে। এখানে আপাতত কেউই নেই। কাচের ছোট্ট কুঠরি দিয়ে ভেতরে তাকিয়ে ছেলেকে দেখার বৃথা চেষ্টা করল রাফিদ। বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই। তবুও কী যেন ভেবে ও নিষ্পলক তাকিয়ে আছে সেদিকে। এভাবেই কয়েক মুহূর্ত পেরিয়ে যাবার পরে আশা-নিরাশায় জর্জরিত এক ক্লান্তিময় দীর্ঘশ্বাসের সাথে চোখটা কয়েকবার নড়ে উঠল রাফিদের। পৃথিবীর সবচাইতে দুর্লভ চিত্রটি দৃশ্যমান হতে দেখা গেল জনশূন্য এই করিডোরের ভেতরে। বাবারাও যে কাঁদে!

একটু তটস্থ হতেই রাফিদ দেখল ফাতিমা ওর দিকে ছুটে আসছে। স্ত্রীকে দেখামাত্রই রাফিদের বুকের ওপর থেকে কষ্ট নামক জগদ্দল পাথরটা যেন সরে গেল। গত রাতের সেই অদ্ভুত স্বপ্ন আর সকালবেলায় ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাপ্রবাহের সবটুকু ভয়, ক্লান্তি নিমিষেই কোথায় যেন হারিয়ে গেল। যেন গতরাতের বৃষ্টিতে ভিজে সব কালিমা ধুয়ে মুছে ভেসে গিয়েছে অন্যত্র।

মনের ভেতরে তার বদলে জন্মেছে ভালোবাসা। পরম মমতায় আগলে রাখা পরিবার নামক এক টুকরো নির্ভার আশ্রয়। চোখ থেকে চশমাটা খুলে শার্টের এক প্রান্ত দিয়ে কাচ দুটো মুছে নিল রাফিদ। ঘাম মোছার ছুতোয় চোখেও একবার হাত বুলিয়ে নিল। যেন কিছুই ঘটেনি ওর সঙ্গে। ফাতিমাও চুপচাপ এড়িয়ে গেল পুরো বিষয়টা। একগাল হাসিসমেত রাফিদ ওর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা ডকিন্স ভাইয়া আসবে কখন, জানো কিছু?'

এখানে বলে রাখি—ডাক্তার রিচার্ড ডকিন্সের বাবা উইলিয়াম ডকিন্স আর রাফিদের বাবা মওদুদ আহমেদ চৌধুরী একসময়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং একই সঙ্গে চৌধুরী পরিবারের পারিবারিক ডাক্তারের ভূমিকাও পালন করতেন স্যার উইলিয়াম ডকিন্স। সেই সুবাদে তাদের দুই পরিবারের মধ্যকার সম্পর্কটা যে অনেক গভীর ছিল তো বলাই